গীতা-প্রবাহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ সহায়িকা

মূল উৎস → *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ – শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

সহায়ক উৎস → *সুবোধিনী – শ্রীল শ্রীধর স্বামীপাদের ভগবদ্গীতা টীকা।

*সারার্থ বর্ষিণী – শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভগবদ্গীতা টীকা।

*গীতা ভূষণ – শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের গীতা ভাষ্য।

*বিদ্বৎ রঞ্জন ও *রসিক রঞ্জন – শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতা ভাষ্যদ্বয়।

*আমার শরণাগত হও – শ্রীপাদ ভূরিজন দাস।

সংকলন - পদ্মমুখ নিমাই দাস

গোবিন্দ চরণ হৈতে, সুরধনী গঙ্গা যৈছে,
ধরণীতে প্রবাহিত হয়।
সে গোবিন্দের মুখ হৈতে, গীতার প্রবাহ তৈছে,
সাধু-সন্ত সভায় সদা বয়॥
সে প্রবাহের এক কণ, ডুবায় যে সর্বজন,
কেন ভাই ভাবিছ অন্যথা।
সে প্রবাহের এক বিন্দু, শুষ্ক করে ভব সিন্ধু,
অলৌকিক এ অদ্ভুত কথা॥
তাহে নিত্য স্নান করি, ওহে ভাই ভজ হরি,
শিরে ধরি তোমার চরণ।
জ্ঞাতি-গোষ্ঠী-বন্ধু লইয়া, সে প্রবাহে ডুব যাইয়া,
পদ্মমুখ করে নিবেদন॥

PADMAMUKHA NIMAI DAS

❀ ভূমিকা-মুখবন্ধ ❀

❀ ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু

- **ঈশ্বর – পরম নিয়ন্তা**
  - পূর্ণ জ্ঞানময় অর্থাৎ সর্বজ্ঞ
- জীব – **জীবসত্তা**
  - ক্ষুদ্র জ্ঞানযুক্ত বা অল্পজ্ঞ।
- **প্রকৃতি – জড়া প্রকৃতি**
  - সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুনের আশ্রয়।
- কাল – **ধ্বংস সাধনকারী কাল**
  - ত্রিগুণ শূন্য জড়দ্রব্য বিশেষ।
- **কর্ম – দেহ ধারনের নিমিত্ত কর্ম**
  - পুরুষের প্রযত্ন সাধ্য অদৃষ্টাদি শব্দ বাচ্য।

ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল নিত্যবস্তু। কর্ম অনাদি হলেও বিনাশী।

❀ ভগবদ্গীতার রূপরেখা

১) কর্মষটক – অধ্যায় (১-৬)

- জীবের স্বরূপ – কৃষ্ণের অংশ, কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবা
- সেই স্বরূপ লাভের পন্থা – নিষ্কাম কর্মযোগ (জ্ঞান এর অন্তর্গত)

২) ভক্তিষটক – অধ্যায় (৭-১২)

- ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় হচ্ছে ভক্তি, যা ভগবানের মহিমা জ্ঞান হতে জন্মে।

৩) জ্ঞানষটক – অধ্যায় (১৩-১৮)

- পূর্বে বর্ণিত বিষয় যেমন ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, প্রভৃতি আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রত্যেকটি ষটকেই কর্ম, জ্ঞান, ও ভক্তি থাকলেও তাদের প্রাধান্য অনুসারে ষটক্‌গুলির নাম প্রদান করা হয়েছে।

❀ অনুবন্ধ চতুষ্টয়ঃ (শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত "গীতা-ভূষণ")

ক) অধিকারী (অভিধেয়) – শ্রদ্ধালু, সদ্ধর্মনিষ্ট, বিজিতেন্দ্রিয়।

- **স্বনিষ্ঠ** – নিষ্ঠাসহ নিষ্কাম কর্ম দ্বারা স্বধর্ম-আচরণ এবং হরিসেবা, কিন্তু কৌতুহলবশত স্বর্গলোক প্রভৃতি দর্শনের বাসনা আছে। এরা আশ্রমের অন্তর্গত। (কৌতুহলবশত অর্থাৎ কেবল ভগবানের ঐশ্বর্য দর্শনের জন্য, কিন্তু ভোগ করার জন্য নয়। সকাম কর্মীরা স্বর্গলোকে ভোগ করতে চায়)
- **পরিনিষ্ঠ** – নিজ আচরনের দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে লোককে ভক্তিপথে আকৃষ্ট করার জন্য সদাচার ও স্বধর্ম পালন করে হরিসেবা করেন। এরাও আশ্রমের অন্তর্গত।
- **নিরপেক্ষ** – সত্য, তপস্যা ও জপ প্রভৃতির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধিলাভ করেছেন, একমাত্র হরিভক্তিতেই আসক্ত। তাঁদের কোন আশ্রম নেই।

খ) সম্বন্ধ[1] – বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ।

- বাচ্য – শ্রীকৃষ্ণ
- বাচক – গীতা

গ) বিষয় – ভগবৎ-তত্ত্ব-নিরূপণ।

ঘ) প্রয়োজন – অবিদ্যা প্রভৃতি অশেষ ক্লেশ নিবৃত্তি পূর্বক শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার।

❀ গীতার ২ ধরনের পাঠকঃ (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত "রসিক-রঞ্জন")

- **স্থূলদর্শী** – কেবল বাক্যার্থ নিয়েই সিদ্ধান্ত করেন।
- **সূক্ষ্মদর্শী** – শাস্ত্রের তাত্ত্বিক অর্থ অনুসন্ধান করেন।

1 এই গ্রন্থটি তার আলোচ্য বিষয়কে প্রকাশ করছে।

গীতা-প্রবাহ

প্রথম অধ্যায় - বিষাদ-যোগ

অধ্যায় কথাসার

রণাঙ্গনে প্রতীক্ষমাণ সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে, মহাযোদ্ধা অর্জুন উভয় পক্ষের সৈন্যসজ্জার মধ্যে সমবেত তাঁর অতি নিকট অন্তরঙ্গ আত্মীয়-পরিজন, আচার্যবর্গ ও বন্ধু-বান্ধবদের সকলকে যুদ্ধে প্রস্তুত হতে এবং জীবন বিসর্জনে উন্মুখ হয়ে থাকতে দেখেন। শোকে ও দুঃখে কাতর হয়ে অর্জুন শক্তিহীন হলেন, তাঁর মন মোহাচ্ছন্ন হল এবং তিনি যুদ্ধ করার সংকল্প পরিত্যাগ করেন।

এই অধ্যায়ের মূল-শিক্ষা

১ম অধ্যায়ে প্রধানত ২টি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়েছে—

- ভগবানের সুরক্ষা – সকল বাহ্যিক ও জাগতিক প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও অন্তিমে বিজয় শরণাগত ভক্তের জন্যই সুনিশ্চিত।
- ভগবান তাঁর ভক্তের ব্যক্তিগত সেবক – ভগবদ্গীতার মূল চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ হচ্ছে তাঁর ভক্তের ব্যক্তিগত সেবক হিসেবে।

অধ্যায় রূপরেখা

- শ্লোক **১.১-২৭** — ভূমিকা
  - শ্লোক **১.১-১১** — যুদ্ধের প্রস্তুতি
  - শ্লোক **১.১২-২০** — পাণ্ডবদের যুদ্ধ জয়ের সংকেতসমূহ
  - শ্লোক **১.২১-২৭** — কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য
- শ্লোক **১.২৮-৪৬** — যুদ্ধ না করার জন্য অর্জুনের পাঁচটি যুক্তি
  - শ্লোক **১.২৮-৩০** — করুণা
  - শ্লোক **১.৩১-৩৫** — উপভোগ
  - শ্লোক **১.৩৬-৩৮** — পাপের ভয়
  - শ্লোক **১.৩৯-৪৩** — পারিবারিক সংস্কৃতি নষ্ট হবার ভয়
  - শ্লোক **২.৬** — সিদ্ধান্তহীনতা

শ্লোক ১.১-২৭ — ভূমিকা

শ্লোক ১.১-১১ — যুদ্ধের প্রস্তুতি

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ →

***শ্লোক ১.১ — ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন ও মনোভাব**

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন- হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মানসে সমবেত হয়ে আমার পুত্র এবং পাণ্ডুর পুত্রেরা তারপর কি করল?

সঞ্জয় উবাচ →

***শ্লোক ১.২ — দ্রোণাচার্যের কাছে দুর্যোধনের গমন এবং উক্তি –**

সঞ্জয় বললেন- হে রাজন্! পান্ডবদের সৈন্যসজ্জা দর্শন করে রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে বললেন-

সঞ্জয়ের ভাষায় বাকপটু দুর্যোধনের উক্তি → ৯টি শ্লোক (৩-১১)

***শ্লোক ১.৩ — দ্রোণাচার্যকে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের রচিত পাণ্ডবদের সৈন্যসজ্জা দেখিয়ে পূর্বশত্রুতাকে সজীব করতে দুর্যোধনের প্রয়াস –**

হে আচার্য! পাণ্ডবদের মহান সৈন্যবল দর্শন করুন, যা আপনার অত্যন্ত বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদের পুত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যূহের আকারে রচনা করেছেন।

***শ্লোক ১.৪-৬ — পাণ্ডবপক্ষের বীরযোদ্ধাদের নাম –**

সেই সমস্ত সেনাদের মধ্যে অনেকে ভীম ও অর্জুনের মতো বীর ধনুর্ধারী রয়েছেন এবং যুযুধান, বিরাট ও দ্রুপদের মতো মহাযোদ্ধা রয়েছেন। সেখানে ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্যের মতো অত্যন্ত বলবান যুধামুন্য, প্রবল পরাক্রমশালী উত্তমৌজা, সুভদ্রার পুত্র এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ। এই সব যোদ্ধারা সকলেই এক-একজন মহারথী।

***শ্লোক ১.৭-৯ — কৌরবপক্ষের অর্থাৎ স্বপক্ষের যোদ্ধাদের নাম –**

হে দ্বিজোত্তম! আমাদের পক্ষে যে সমস্ত বিশিষ্ট সেনাপতি সামরিক শক্তি পরিচালনার জন্য রয়েছেন, আপনার অবগতির জন্য আমি তাঁদের সম্বন্ধে বলছি। সেখানে রয়েছেন আপনার মতোই ব্যক্তিত্বশালী-ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপা, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা, যাঁরা সর্বদা সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে থাকেন। এ ছাড়া আরও বহু সেনানায়ক রয়েছেন, যাঁরা আমার জন্য তাঁদের জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাঁরা সকলেই নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং তাঁরা সকলেই সামরিক বিজ্ঞানে বিশারদ।

***শ্লোক ১.১০-১১ – আমরা ভীষ্মের দ্বারা সুরক্ষিত এবং পাণ্ডবেরা ভীমের দ্বারা সুরক্ষিত –**

আমাদের সৈন্যবল অপরিমিত এবং আমার পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা পূর্ণরূপে সুরক্ষিত, কিন্তু ভীমের দ্বারা সতর্কভাবে সুরক্ষিত পাণ্ডবদের শক্তি সীমিত। এখন আপনারা সকলে সেনাব্যূহের প্রবেশপথে নিজ নিজ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থিত হয়ে পিতামহ ভীষ্মকে সর্বতোভাবে সাহায্য প্রদান করুন।

শ্লোক ১.১২-২০ — পাণ্ডবদের যুদ্ধ জয়ের সংকেতসমূহ

সঞ্জয়ের ভাষায় যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা →

***শ্লোক ১.১২ — (সংঙ্গতি)[2] রাজা দুর্যোধনের বহুমানযুক্ত বাক্য শুনে ভীষ্মদেব কি করলেন? –**

ভীষ্মের উচ্চনাদে শঙ্খবাদন – তখন কুরুবংশের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনের হর্ষ উৎপাদনের জন্য সিংহের গর্জনের মতো অতি উচ্চনাদে তাঁর শঙ্খ বাজালেন।

***শ্লোক ১.১৩ — (সংঙ্গতি) তারপর ভীষ্মদেবের যুদ্ধোৎসাহ দেখে সর্বত্রই যুদ্ধোৎসাহ আরম্ভ হল –**

শঙ্খসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র একত্রে ধ্বনিত হয়ে তুমুল শব্দের সৃষ্টি – তারপর শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, ঢাক ও গোমুখ শিঙাসমূহ হঠাৎ একত্রে ধ্বনিত হয়ে এক তুমুল শব্দের সৃষ্টি হল।

***শ্লোক ১.১৪ — (সংঙ্গতি) তারপর পাণ্ডবদের যুদ্ধে ঔৎসুক্যের কথা পাঁচটি শ্লোকে বলছেন (১৪-১৮) –**

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খবাদন – অন্য দিকে, শ্বেত অশ্বযুক্ত এক দিব্য রথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ে তাঁদের দিব্য শঙ্খ বাজালেন।

---

2 সঙ্গতি - প্রামানিক শাস্ত্রভাষ্যকার আচার্যগণ তাদের ভাষ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শ্লোকের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন করেন যাকে সংস্কৃত ভাষায় সর্বজনস্বীকৃতভাবে 'সঙ্গতি' বলা হয়। এই সংকলনে সঙ্গতিগুলি মূলত শ্রীল শ্রীধর স্বামীপাদের 'সুবোধিনী' টীকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের 'সারার্থ বর্ষিণী' এবং শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের 'গীতা ভূষণ' থেকেও গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও সাধারন পাঠকের দ্বারা গীতার মূল শ্লোকে এই সঙ্গতিগুলি পাওয়া যায় না, কিন্তু নিত্যসিদ্ধ আচার্যগণ যেহেতু ভক্তিবলে ত্রিকালজ্ঞ সেহেতু এই শ্লোকগুলি বলার সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের মনোভাব তাঁরা অনায়াসে জানতে পারেন। তাই আমাদের মত বদ্ধ জীবদের প্রতি সুবিশেষ কৃপাবশ হয়ে তাঁরা সেই গুহ্যভাবগুলি তাঁদের টীকায় প্রকাশ করেছেন।

***শ্লোক ১.১৫-১৮ – শ্রীকৃষ্ণসহ পঞ্চপাণ্ডবদের শঙ্খের নাম এবং অন্য যোদ্ধাদেরও নিজ নিজ শঙ্খবাদন –**

তখন, শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক তাঁর শঙ্খ বাজালেন অর্জুন বাজালেন, তাঁর দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং বিপুল ভোজনপ্রিয় ও ভীমকর্মা ভীমসেন বাজালেন পৌণ্ড্র নামক তাঁর ভয়ংকর শঙ্খ। কুন্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ বাজালেন এবং নকুল ও সহদেব বাজালেন সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নাম শঙ্খ। হে মহারাজ! তখন মহান ধনুর্ধর কাশীরাজ, প্রবল যোদ্ধা শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সুভদ্রার মহা বলবান পুত্র এবং অন্য সকলে তাঁদের নিজ নিজ পৃথক শঙ্খ বাজালেন।

***শ্লোক ১.১৯ – (সংঙ্গতি) সেই শঙ্খনাদ তোমার (ধৃতরাষ্ট্রের) পক্ষীয়গণের মহাভয় উৎপাদন করল –**

প্রচণ্ড শঙ্খনিনাদে কৌরবদের হৃদয় বিদারণ – শঙ্খ-নিনাদের সেই প্রচন্ড শব্দ আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হৃদয় বিদারিত করতে লাগল।

***শ্লোক ১.২০ – বিশেষ রথ অধিষ্ঠিত এবং শর নিক্ষেপে প্রস্তুত অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিম্নোক্ত উক্তি –**

সেই সময় পান্ডুপুত্র অর্জুন হনুমান চিহ্নিত পতাকা শোভিত রথে অধিষ্ঠিত হয়ে, তাঁর ধনুক তুলে নিয়ে শর নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত হলেন। হে মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সমরসজ্জায় বিন্যস্ত দেখে, অর্জুন তখন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বললেন ।

পাণ্ডবদের বিজয়ের সংকেতসমূহঃ

- কৃষ্ণের স্বয়ং উপস্থিতি (১.১৪)
- লক্ষীদেবীর উপস্থিতি (১.১৪)
- স্থানঃ কুরুক্ষেত্র (১.১)
- রথের ধ্বজায় শ্রী হনুমানের উপস্থিতি (১.২০)
- দিব্য শঙ্খ (১.১৪)
- অগ্নিদেব প্রদত্ত রথ (১.১৪)
- কৌরবদের হৃদকম্পন (১.১৯)

শ্লোক ১.২১-২৭ — কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য

সঞ্জয়ের ভাষায় অর্জুনের উক্তি →

***শ্লোক ১.২১-২২ — উভয়পক্ষের সেনাদের মাঝখানে রথ স্থাপন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের উক্তি –**

অর্জুন বললেন- হে অচ্যুত! তুমি উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে আমার রথ স্থাপন কর, যাতে আমি দেখতে পারি যুদ্ধ করার অভিলাষী হয়ে কারা এখানে এসেছে এবং এই মহা সংগ্রামে আমাকে কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।

***শ্লোক ১.২৩ – অর্জুনের হঠাৎ এরকম ইচ্ছাপোষণের কারণ –**

ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রকে সন্তুষ্ট করার বাসনা করে যারা এখানে যুদ্ধ করতে এসেছে, তাদের আমি দেখতে চাই।

সঞ্জয় উবাচ (অতঃপর কি হল তার বর্ণনা) →

***শ্লোক ১.২৪ – অর্জুনের আদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণের উভয় সেনাদের মাঝখানে রথ স্থাপন –**

সঞ্জয় বললেন- হে ভরত-বংশধর! অর্জুন কর্তৃক এভাবে আদিষ্ট হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ সেই অতি উত্তম রথটি চালিয়ে নিয়ে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে রাখলেন।

***শ্লোক ১.২৫ – শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভীষ্ম, দ্রোণসহ সমস্ত কৌরবদেরকে দেখতে বললেন –**

ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ পৃথিবীর অন্য সমস্ত নৃপতিদের সামনে ভগবান হৃষীকেশ বললেন, হে পার্থ! এখানে সমবেত সমস্ত কৌরবদের দেখ।

***শ্লোক ১.২৬ – উভয় পক্ষের সেনাদলের মধ্যে অর্জুন কর্তৃক গুরুবর্গ ও আত্মীয়দের দর্শন –**

তখন অর্জুন উভয় পক্ষের সেনাদলের মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, মিত্র ও শুভাকাঙ্খীদের উপস্থিত দেখতে পেলেন।

***শ্লোক ১.২৭ – (সংঙ্গতি) এসব দেখে অর্জুন কি করলেন? –**

গুরুবর্গ ও আত্মীয়দের দর্শন করে কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ন অর্জুনের উক্তি – যখন কুন্তীপুত্র অর্জুন সকল রকমের বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখলেন, তখন তিনি অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট ও বিষন্ন হয়ে বললেন।

শ্লোক ১.২৮-৪৬ — যুদ্ধ না করার জন্য অর্জুনের পাঁচটি যুক্তি

শ্লোক ১.২৮-৩০ — করুণা

২.১১-২.৩০ শ্লোকে এর খণ্ডন করা হয়েছে

সঞ্জয়ের ভাষায় অর্জুনের উক্তি →

***শ্লোক ১.২৮-৩০ – অর্জুনের অবস্থা**

অর্জুন বললেন- হে প্রিয়বর কৃষ্ণ! আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের এমনভাবে যুদ্ধাভিলাষী হয়ে আমার সামনে অবস্থান করতে দেখে আমার –

- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হচ্ছে,
- মুখ শুষ্ক হয়ে উঠছে,
- সর্বশরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হচ্ছে,
- হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ছে,
- ত্বক যেন জ্বলে যাচ্ছে,
- স্থির থাকা সম্ভব হচ্ছে না,
- আত্মবিস্মৃতি হচ্ছে,
- চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হচ্ছে,
- কেবল অমঙ্গলসূচক লক্ষণসমূহ দর্শন হচ্ছে।

শ্লোক ১.৩১-৩৫ — উপভোগ

২.৩১-২.৩২ শ্লোকে এর খণ্ডন করা হয়েছে

***শ্লোক ১.৩১ — নিষ্কাম অর্জুন –**

হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনদের নিধন করা শ্রেয়স্কর দেখছি না। আমি যুদ্ধে জয়লাভ চাই না, রাজ্য এবং সুখভোগও কামনা করি না।

***শ্লোক ১.৩২-৩৫ – যাদের জন্য রাজ্য ও ভোগসুখের কামনা, তারা সকলেই এই রণক্ষেত্রে আজ উপস্থিত? পৃথিবীর তো কথাই নেই, এমন কি সমগ্র ত্রিভুবনের বিনিময়েও আমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই –**

হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন, আর সুখভোগ বা জীবন ধারণেই বা কী প্রয়োজন, যখন দেখছি- যাদের জন্য রাজ্য ও ভোগসুখের কামনা, তারা সকলেই এই রণক্ষেত্রে আজ উপস্থিত? হে মধুসূদন! যখন আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও আত্মীয়স্বজন, সকলেই প্রাণ ও ধনাদির আশা পরিত্যাগ করে আমার সামনে যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন, তখন তাঁরা আমাকে বধ করলেও আমি তাঁদের হত্যা করতে চাইব কেন? হে সমস্ত জীবের প্রতিপালক জনার্দন! পৃথিবীর তো কথাই নেই, এমন কি সমগ্র ত্রিভুবনের বিনিময়েও আমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিধন করে কি সন্তোষ আমরা লাভ করতে পারব?

সারকথা →

- **অর্জুনের ইচ্ছা** – যুদ্ধ করবেন না, দুর্বৃত্তদের ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন।
  - কেন ? – দেহাত্মবুদ্ধি – দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহানুভূতি, এছাড়াও একাকী রাজ্যভোগ অসম্ভব –ভক্তোচিত গুণ – সকলের প্রতি করুণা
- **কৃষ্ণের ইচ্ছা** – অর্জুনকে দিয়ে যুদ্ধ করিয়ে কৌরবদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।
  - কেন ? – কারণ তারা তাঁর ভক্ত পাণ্ডবদের কাছে অপরাধ করেছিল।

শ্লোক ১.৩৬-৩৮ — পাপের ভয়

২.৩৩-২.৩৭ শ্লোকে এর খণ্ডন করা হয়েছে

***শ্লোক ১.৩৬ – (সঙ্গতি) কৃষ্ণ যদি বলেন যে, "অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রধারী এবং ধন, ক্ষেত্র ও স্ত্রী অপহরণকারী এই ছয়জনই আততায়ী বলে স্মৃতিশাস্ত্রে অভিহিত হয়, এবং দুর্যোধন আদি কৌরবেরা এই ছয়প্রকারেই পাণ্ডবদের কাছে আততায়ী।[3] অতএব তাদেরকে বধ করাই যুক্তিযুক্ত। কেননা শাস্ত্রে বল হয়েছে, আততায়ীকে আসতে দেখলে বিচার না করেই বধ করা কর্তব্য। আততায়ী বধে কোন পাপ হয় না।" কৃষ্ণের কাছ থেকে এরূপ যুক্তি আশঙ্কা করে অর্জুন বলছেন, "আততায়ীদের বধ করা উচিত, এটি অর্থশাস্ত্রের কথা। অর্থশাস্ত্রের বচন ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা দুর্বল।[4]" –**

এদের হত্যা করলে মহাপাপ আমাদের আচ্ছন্ন করবে – এই ধরনের আততায়ীদের বধ করলে মহাপাপ আমাদের আচ্ছন্ন করবে। সুতরাং বন্ধুবান্ধব সহ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সংহার করা আমাদের পক্ষে অবশ্যই উচিত হবে না। হে মাধব, লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ! আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করে আমাদের কী লাভ হবে? আর তা থেকে আমরা কেমন করে সুখী হব?

***শ্লোক ১.৩৭-৩৮ — (সঙ্গতি) কৃষ্ণ যদি বলেন, "তোমার মত ত কৌরবদেরও বন্ধুবধজনিত পাপ সমানই হবে। অতএব, এরা যেমন বন্ধুবধজনিত পাপ স্বীকার করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে, তুমিও সেরূপ হও।" একথা আশঙ্কা করে অর্জুন বলছেন –**

রাজ্যলোভে অভিভূত হয়ে তারা এই পাপ লক্ষ্য করছে না, কিন্তু আমরা ত তা লক্ষ্য করছি – হে জনার্দন! যদিও এরা রাজ্যলোভে অভিভূত হয়ে কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ নিমিত্ত পাপ লক্ষ্য করছে না, কিন্তু আমরা কুলক্ষয় জনিত দোষ লক্ষ্য করেও এই পাপকর্মে কেন প্রবৃত্ত হব?

শ্লোক ১.৩৯-৪৩ — পারিবারিক সংস্কৃতি নষ্ট হবার ভয়

২.৪৫-৪৬ এবং ৩.২৪ শ্লোকে এর খণ্ডন করা হয়েছে

***শ্লোক ১.৩৯ — কুলক্ষয়ের ফল – কুলধর্ম বিনষ্ট –**

কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম বিনষ্ট হয় এবং তা হলে সমগ্র বংশ অধর্মে অভিভুত হয়।

---

3 জতুগৃহে অগ্নিপ্রদান, ভীমসেনকে বাল্যকালে বিষপ্রদান, যুদ্ধে শস্ত্র দ্বারা আক্রমণকারী, অসৎ সভায় দ্যূতক্রীড়ায় ধন, ক্ষেত্র ও স্ত্রী অপহরণকারী, অতএব এই ছয়প্রকারেই কৌরবেরা আততায়ী।

4 যাজ্ঞবল্ক্য – "দুই স্মৃতিশাস্ত্রমধ্যে বিরোধ হইলে ব্যাবহারানুকূল ন্যায়ই বলবান্ হয় আর অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্মশাস্ত্রই বলবান, ইহাই নিশ্চয়।"

***শ্লোক ১.৪০ — কুলবধুগণের ব্যভিচারে প্রবৃত্তি এবং অবাঞ্ছিত প্রজাতির উৎপত্তি –**

হে কৃষ্ণ! কুল অধর্মের দ্বারা অভিভূত হলে কুলবধূগণ ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হয় এবং হে বার্ষ্ণেয়! কুলস্ত্রীগণ অসৎ চরিত্রা হলে অবাঞ্ছিত প্রজাতি উৎপন্ন হয়।

***শ্লোক ১.৪১ — কুল, কুলঘাতক এবং পিতৃপুরুষদের নরকগমন –**

বর্ণসঙ্কর উৎপাদন বৃদ্ধি হলে কুল ও কুলঘাতকেরা নরকগামী হয়। সেই কুলে পি-দান ও তর্পণক্রিয়া লোপ পাওয়ার ফলে তাদের পিতৃপুরুষেরাও নরকে অধঃপতিত হয়।

***শ্লোক ১.৪২ — সর্বপ্রকার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প এবং বংশের কল্যাণ-ধর্ম উৎসন্নে যায় –**

যারা বংশের ঐতিহ্য নষ্ট করে এবং তার ফলে অবাঞ্ছিত সন্তানাদি সৃষ্টি করে, তাদের কুকর্মজনিত দোষের ফলে সর্বপ্রকার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প এবং বংশের কল্যাণ-ধর্ম উৎসন্নে যায়।

***শ্লোক ১.৪৩ — কুলধর্ম বিনষ্ট হওয়ার ফল –**

হে জনার্দন! আমি পরম্পরাক্রমে শুনেছি যে, যাদের কুলধর্ম বিনষ্ট হয়েছে, তাদের নিয়ত নরকে বাস করতে হয়।

***শ্লোক ১.৪৪-৪৫ — (সঙ্গতি) বন্ধুবধ কার্যে উদ্যত হয়ে সন্তাপ করতে করতে মৃত্যু কামনা করে অর্জুন বলছেন –**

অর্জুনের খেদ – হায়! কী আশ্চার্যের বিষয় যে, আমরা রাজ্যসুখের লোভে স্বজনদের হত্যা করতে উদ্যত হয়ে মহাপাপ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি। প্রতিরোধ রহিত ও নিরস্ত্র অবস্থায় আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যুদ্ধে বধ করে, তা হলে আমার অধিকতর মঙ্গলই হবে।

সঞ্জয় উবাচ →

***শ্লোক ১.৪৬ — ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকে ভারাক্রান্ত চিত্তে অর্জুনের রথোপরি উপবেশন –**

সঞ্জয় বললেন- রণক্ষেত্রে এই কথা বলে অর্জুন তাঁর ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকে ভারাক্রান্ত চিত্তে রথোপরি উপবেশন করলেন।

অধ্যায় উপসংহার

***** শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ →**

অহিংস্রস্যাত্মজিজ্ঞাসা দয়ার্দ্রস্যোপজায়তে।
তদ্বিরুদ্ধস্য নৈবেতি প্রথমাদুপধারিতম্॥

প্রথম অধ্যায় হতে এটিই সিদ্ধান্ত হল যে, যে ব্যক্তি জীবহিংসা হতে বিরত এবং দয়ার্দ্র চিত্ত তার আত্মজিজ্ঞাসা (আত্মজ্ঞান বিষয়ে বিচার) জন্মে, যে তার বিপরীত অর্থাৎ জীবহিংসাপরায়ণ ও নিষ্ঠুর চিত্ত, তার তা হয় না।

গীতা-প্রবাহ

দ্বিতীয় অধ্যায় – সাংখ্য-যোগ

অধ্যায় কথাসার

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শোকাকুলের ন্যায় অভিনয়কারী অর্জুনকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ প্রদান করে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ প্রকাশ করেছেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর শিষ্যরূপে অর্জুন আত্মসমর্পণ করেন এবং অনিত্য জড় দেহ ও শাশ্বত চিন্ময় আত্মার মূলগত পার্থক্য নির্ণয়ের মাধ্যমে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ প্রদান করতে শুরু করেন। দেহান্তর প্রক্রিয়া, পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ সেবার প্রকৃতি এবং আত্মজ্ঞানলব্ধ মানুষের বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

এই অধ্যায়ের মূল-শিক্ষা

দেহধর্ম অনিত্য ও নৈমিত্তিক, আত্মধর্মই নিত্য স্বরূপধর্ম।

এই অধ্যায় সম্পর্কে পূর্বাচার্য গীতা-ভাষ্যকারগণের সিদ্ধান্ত

*** শ্রীল শ্রীধর স্বামী →

দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শোকসন্তপ্ত অর্জুনকে ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্ধারণ করলেন।

*** শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর →

আত্মানাত্মবিবেকেন শোকমোহতমো নুদন্।
দ্বিতীয়ে কৃষ্ণচন্দ্রোঽত্র প্রোচে মুক্তস্য লক্ষণম্॥

আত্মানাত্মবিবেক দ্বারা শোকমোহরূপ তমঃ দূর করে দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণচন্দ্র মুক্তজনের লক্ষণ বলেছেন।

*** শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ →

দ্বিতীয়ে জীবযাথাত্ম্যজ্ঞানং তৎসাধনং হরিঃ।
নিষ্কামকর্ম চ প্রোচে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষনম্॥

জীবের যথাযথ আত্মজ্ঞান, তার প্রাপ্তির উপায়, নিষ্কাম কর্ম এবং স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীহরি কর্তৃক কথিত হয়েছে।

*** শ্রীল প্রভুপাদ →

গীতার এই অধ্যায়ে জড় দেহ ও চেতন আত্মার সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার মাধ্যমে পরম নিয়ন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন - আমাদের স্বরূপ কি, আমাদের প্রকৃত পরিচয় কি। পারমার্থিক তত্ত্বের উপলব্ধি এবং কর্মফলে নিরাসক্তি ছাড়া এই অনুভূতি হয় না।

অধ্যায় সঙ্গতি

১ম অধ্যায়ে অর্জুন যুদ্ধ না করার জন্য যে যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করেছিলেন, এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেগুলি ক্রমান্বয়ে খণ্ডন করবেন।

অধ্যায় রূপরেখা

- শ্লোক ১ – ১০ - কৃষ্ণের কাছে অর্জুনের আত্মসমর্পণ
- শ্লোক ১১ - ৩০ – জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধ কর
- শ্লোক ৩১ – ৩৮ – কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে যুদ্ধ কর
- শ্লোক ৩৯ - ৫৩ - বুদ্ধিযোগ স্তরে অধিষ্টিত হয়ে যুদ্ধ কর
- শ্লোক ৫৪ - ৭২ - স্থিতপ্রজ্ঞ বা সমাধি স্তরে অধিষ্টিত হয়ে যুদ্ধ কর

শ্লোক ১ – ১০ - কৃষ্ণের কাছে অর্জুনের আত্মসমর্পণ

***শ্লোক ১ — (সঙ্গতি) অর্জুন গাণ্ডীব পরিত্যাগ করে রথের উপর উপবিষ্ট হলে কি ঘটেছিল? –**

অর্জুনের করুণ অবস্থা দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি – সঞ্জয় বললেন- অর্জুনকে এভাবে অনুতপ্ত, ব্যাকুল ও অশ্রুসিক্ত দেখে, কৃপায় আবিষ্ট হয়ে মধুসূদন বা শ্রীকৃষ্ণ এই কথাগুলি বললেন।

***শ্লোক ২-৩ —**

অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভর্ৎসনা – পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বললেন- প্রিয় অর্জুন, এই ঘোর সঙ্কটময় যুদ্ধস্থলে যারা জীবনের প্রকৃত মূল্য বোঝে না, সেই সব অনার্যের মতো শোকানল তোমার হৃদয়ে কিভাবে প্রজ্বলিত হল? এই ধরনের মনোভাব তোমাকে স্বর্গলোকে উন্নীত করবে না, পক্ষান্তরে তোমার সমস্ত যশরাশি বিনষ্ট করবে। হে পার্থ! এই সম্মান হানিকর ক্লীবত্বের বশবর্তী হয়ো না। এই ধরনের আচরণ তোমার পক্ষে অনুচিত। হে পরন্তপ! হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র দুর্বলতা পরিত্যাগ করে তুমি উঠে দাঁড়াও।

***শ্লোক ৪ — (সঙ্গতি) আমি হৃদয়ের দুর্বলতাবশতঃ যুদ্ধ হতে নিরস্ত হচ্ছি না, কিন্তু এই যুদ্ধকার্য অন্যায় ও অধর্মকর বলেই তা থেকে ক্ষান্ত হচ্ছি - একথা বুঝাবার জন্য অর্জুন বলছেন -**

অর্জুনের আত্মপক্ষ সমর্থন – অর্জুন বললেন- হে অরিসূদন ! হে মধুসূদন ! এই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো পরম পূজনীয় ব্যক্তিদের কেমন করে আমি বাণের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব?

***শ্লোক ৫ — (সঙ্গতি) শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, "তাঁদেরকে বধ না করে তোমার দেহযাত্রা কিভাবে নির্বাহ হবে?" এর উত্তরে অর্জুন বলছেন –**

শিক্ষাগুরুদের হত্যার বিনিময়ে প্রাপ্ত ভোগের পরিবর্তে ভিক্ষার জীবন আরও ভাল – আমার মহানুভব শিক্ষাগুরুদের জীবন হানি করে এই জগৎ ভোগ করার থেকে বরং ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করা ভাল। তাঁরা পার্থিব বস্তুর অভিলাষী হলেও আমার গুরুজন। তাঁদের হত্যা করা হলে, যুদ্ধলব্ধ সমস্ত ভোগ্যবস্তু তাঁদের রক্তমাখা হবে।

***শ্লোক ৬-৭ — (সঙ্গতি) আর অধর্ম হয় হউক, এরূপ স্থির করে যদি যুদ্ধ করি, তথাপি আমাদের জয় কিংবা পরাজয়ের কোনটি শ্রেয়, তা বুঝতে পারছি না, তাই বলছেন –**

অর্জুনের সিদ্ধান্তহীনতা ও শরণাগতি – তাদের জয় করা শ্রেয়, না তাদের দ্বারা পরাজিত হওয়া শ্রেয়, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমরা যদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হত্যা করি, তা হলে আমাদের আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে না। তবুও এই রণাঙ্গনে তারা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। কার্পণ্যজনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্যমূঢ় হয়েছি এবং আমার কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়েছি। এই অবস্থায় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, এখন কি করা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, তা আমাকে বল। এখন আমি তোমার শিষ্য এবং সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত। দয়া করে তুমি আমাকে নির্দেশ দাও।

***শ্লোক ৮ — (সঙ্গতি) শ্রীকৃষ্ণ হয়ত বলতে পারেন, "হে অর্জুন, যা তোমার নিজের পক্ষে ভাল, তা তুমিই বিবেচনা করে স্থির কর।" এরূপ আশঙ্কা করে অর্জুন বললেন –**

স্বীয় দুর্বলতার কথা প্রকাশ – আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে শুকিয়ে দিচ্ছে যে শোক, তা দূর করবার কোন উপায় আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এমন কি স্বর্গের দেবতাদের মতো আধিপত্য নিয়ে সমৃদ্ধিশালী, প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন রাজ্য এই পৃথিবীতে লাভ করলেও আমার এই শোকের বিনাশ হবে না।

***শ্লোক ৯ — (সঙ্গতি) এরূপ বলে অর্জুন কি করলেন? এই মর্মে সঞ্জয় বললেন –**

যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে অর্জুনের মৌনাবস্থা অবলম্বন – এভাবে মনোভাব ব্যক্ত করে গুড়াকেশ অর্জুন তখন হৃষীকেশকে বললেন, "হে গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করব না," এই বলে তিনি মৌন হলেন।

***শ্লোক ১০ — (সঙ্গতি) তারপর কি হল? –**

স্মিত হেসে ভগবানের বাণী – হে ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র! সেই সময় স্মিত হেসে শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে এই কথা বললেন।

শ্লোক ১১ - ৩০ – জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধ কর

[যুদ্ধ না করার ১ম যুক্তি (করুণা) খণ্ডন]

***শ্লোক ১১ — (সঙ্গতি) অর্জুনের এই শোকের কারণ ছিল দেহ ও আত্মার পার্থক্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা। অতএব সেই দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য শ্রীভগবান বললেন –**

যথার্থ পণ্ডিত কখনও কারও জন্য শোক করেন না – তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে শোক করছ। যাঁরা যথার্থই পন্ডিত তাঁরা কখনও জীবিত অথবা মৃত কারও জন্যই শোক করেন না।

***শ্লোক ১২ — (সঙ্গতি) কেন অশোচ্য ? –**

নিত্য অস্তিত্ব – এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি ও এই সমস্ত রাজারা ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও কখনও আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না।

***শ্লোক ১৩ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "ওহে! তুমি ত ঈশ্বর, তোমার যে জন্ম-মরণ নেই তা সত্য, কিন্তু জীবের ত' জন্মমরণ আছে।" এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন –**

স্থিতপ্রজ্ঞ পন্ডিতেরা আত্মার দেহান্তরে মুহ্যমান হন না – দেহীর দেহ যেভাবে কৌমার, যৌবন ও জরার মাধ্যমে তার রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পন্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।

***শ্লোক ১৪ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "আমি তাঁদের জন্য শোক করছি না। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুতে পরবর্তীতে আমিই দুঃখভাগী হব। অতএব সেহেতু আমি নিজের জন্যই শোক করছি।" এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন –**

শীত ও গ্রীষ্মের গমনাগমনের ন্যায় সুখ ও দুঃখকেও সহ্য কর – হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ ও দুঃখের অনুভব হয়। সেগুলি ঠিক যেন শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল-প্রদীপ! সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।

***শ্লোক ১৫ — (সঙ্গতি) দুঃখ প্রতীকারের চেষ্টা করা অপেক্ষা তা সহ্য করাই উচিত, কেননা তাতে মহাফল লাভ হয়, – সেজন্য বলছেন –**

মুক্তি লাভের প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তির লক্ষণ – হে পুরুষশ্রেষ্ঠ (অর্জুন)! যে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন এবং শীত ও উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বে বিচলিত হন না, তিনিই মুক্তি লাভের প্রকৃত অধিকারী।

***শ্লোক ১৬ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "শীত-উষ্ণ ইত্যাদি অত্যন্ত দুঃসহ, তা কিভাবে সহ্য করব? অত্যধিক সহ্য করলে কখনও আত্মনাশ ঘটতে পারে।" এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন যে, এরূপ আশঙ্কা ঠিক নয়। কারণ তত্ত্ববিচারপূর্বক ঐ সকল সহ্য করতে পারা যায়।**

আত্মা ও জড় বস্তু সম্বন্ধে তত্ত্বদ্রষ্টা ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত – যাঁরা তত্ত্বদ্রষ্টা তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে অনিত্য জড় বস্তুর স্থায়িত্ব নেই এবং নিত্য বস্তু আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। তাঁরা উভয় প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

***শ্লোক ১৭ — (সঙ্গতি) পূর্বশ্লোকে সদ্‌বস্তুটি অবিনাশী – এটি সামান্যভাবে বলেছেন, এখন তা বিশেষভাবে বলছেন –**

আত্মা অবিনাশী, সমগ্র শরীরে পরিব্যপ্ত – যা সমগ্র শরীরে পরিব্যপ্ত হয়ে রয়েছে, তাকে তুমি অবিনাশী বলে জানবে। সেই অব্যয় আত্মাকে কেউ বিনাশ করতে সক্ষম নয়।

***শ্লোক ১৮ — (সঙ্গতি) উৎপত্তি ও বিনাশশীল অসতের স্বরূপ কি? –**

আত্মা ও জড়দেহের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য জেনে যুদ্ধ কর – অবিনাশী, অপরিমেয় ও শাশ্বত আত্মার জড় দেহ নিঃসন্দেহে বিনাশশীল। অতএব হে ভারত! তুমি শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম পরিত্যাগ না করে যুদ্ধ কর।

***শ্লোক ১৯ — (সঙ্গতি) তোমার ভীষ্মাদির মৃত্যুজনিত শোক নিবারিত হল, কিন্তু "আমি এদেরকে বধ করতে ইচ্ছা করি না" ইতাদি বলে যে আত্মাকে হন্তা বলে দুঃখ প্রকাশ করা হচ্ছে তাও যে অকারণ, সেটিই বলছেন –**

আত্মা কি হন্তা নাকি হত? – যিনি জীবাত্মাকে হন্তা বলে মনে করেন কিংবা যিনি একে নিহত বলে ভাবেন, তাঁরা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানেন না। কারণ আত্মা কাউকে হত্যা করেন না এবং কারও দ্বারা নিহতও হন না।

***শ্লোক ২০ — (সঙ্গতি) আত্মা যে হত হয় না, তা যে জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও নাশরূপ ষড়্ বিকারশূন্য, সেটিই দৃঢ় করে বলছেন –**

আত্মার স্বরূপ (বৈশিষ্ট্য) – আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন হলেও চিরনবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না।

***শ্লোক ২১ — (সঙ্গতি) অতএব পূর্বে যে বলা হয়েছিল, "আত্মা হন্তা নয়", – সেটি বলছেন।**

আত্মার স্বরূপ (বৈশিষ্ট্য) সম্বন্ধে জ্ঞাত ব্যক্তি কিভাবে হত্যাকারী হতে পারেন? – হে পার্থ! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, শাশ্বত, জন্মরহিত ও অক্ষয় বলে জানেন, তিনি কিভাবে কাউকে হত্যা করতে বা হত্যা করাতে পারেন?

***শ্লোক ২২ — সঙ্গতিঃ অর্জুন যদি বলেন, "আত্মা অবিনাশী হলেও তার শরীরের নাশ হয়, এটি পর্য্যালোচনা করে শোক করছি।" তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোক বলছেন –**

দৃষ্টান্তঃ আত্মার দেহ পরিবর্তনের সাথে মানুষের জীর্ণ বস্ত্র পরিবর্তনের তুলনা – মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন।

***শ্লোক ২৩ — (সঙ্গতি) "কথং হন্তি" – 'কি প্রকারে বধ করে' (শ্লোক ২১) ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত বাক্যদ্বারা বধসাধনের অভাব দেখিয়ে আত্মার অবিনাশিত্ব পরিস্ফুট করে বলছেন –**

আত্মার স্বরূপ (বৈশিষ্ট্য) – আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, অথবা হাওয়াতে শুকানোও যায় না।

***শ্লোক ২৪ — (সঙ্গতি) উক্ত বিষয়ে কারণ দেড়টি শ্লোক দ্বারা বলছেন –**

আত্মার স্বরূপ (বৈশিষ্ট্য) – এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। তিনি চিরস্থায়ী, সর্বব্যাপ্ত, অপরিবর্তনীয়, অচল ও সনাতন।

***শ্লোক ২৫ — (সঙ্গতি) উক্তবাক্যের উপসংহার করছেন –**

এই আত্মার স্বরূপ জেনে দেহের জন্য শোক করা উচিত নয় – এই আত্মাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী বলে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে। অতএব এই সনাতন স্বরূপ অবগত হয়ে দেহের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।

***শ্লোক ২৬ — (সঙ্গতি) "আত্মার জন্য শোক করা কর্তব্য নয়" — এটি পূর্বে বলা হয়েছে। "এখন দেহের সাথে আত্মার জন্ম এবং দেহের নাশ হলে আত্মারও নাশ হয়"— এটি স্বীকার করলেও শোক করা কর্তব্য নয়। এটিই বলছেন –**

বিকল্প যুক্তির দ্বারা সান্ত্বনা দেবার প্রচেষ্টা – হে মহাবাহো! আর যদি তুমি মনে কর যে, আত্মার বারবার জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয়, তা হলেও তোমার শোক করার কোন কারণ নেই।

***শ্লোক ২৭ — সঙ্গতিঃ কেন শোক করবে না? –**

অবশ্যম্ভাবী জন্ম-মৃত্যুর জন্য শোক করা উচিত নয় – যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অতএব অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করার সময় তোমার শোক করা উচিত নয়।

***শ্লোক ২৮ — (সঙ্গতি) আর, কর্মের জন্য দেহাদি হয় ও নাশ পায় — এরূপ দেহাদির স্বভাব পর্য্যালোচনা করে আত্মার যে জন্মমরণ, তা দেহরূপ উপাধিবশত হয় বলে শোক করা কর্তব্য নয়। তাই বলছেন –**

জীবের অস্তিত্ব নিত্য – কখনো অপ্রকাশিত, কখনো প্রকাশিত – হে ভারত! সমস্ত সৃষ্ট জীব উৎপন্ন হওয়ার আগে অপ্রকাশিত ছিল, তাদের স্থিতিকালে প্রকাশিত থাকে এবং বিনাশের পর আবার অপ্রকাশিত হয়ে যায়। সুতরাং সেই জন্য শোক করার কি কারণ ?

***শ্লোক ২৯ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "তাহলে এই সংসারে বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও কেন শোক করেন?" তার উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন, "আত্মার বিষয়ে অজ্ঞানই এর কারণ।" এই অভিপ্রায়ে আত্মার দুর্বিজ্ঞেয়ত্ব বলছেন –**

আত্মার আশ্চর্যবৎ প্রতীতি – কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যবৎ দর্শন করেন, কেউ আশ্চর্যভাবে বর্ণনা করেন এবং কেউ আশ্চর্য জ্ঞানে শ্রবণ করেন, আর কেউ শুনেও তাকে বুঝতে পারেন না।

***শ্লোক ৩০ — (সঙ্গতি) উক্ত প্রকারে আত্মার অবধ্যত্ব সংক্ষেপে বলে শোক করা যে অনুচিত তারই উপসংহার করছেন।**

আত্মা সর্বদাই অবধ্য, তাই কোন জীবের জন্য শোক করা উচিত নয় – হে ভারত! প্রাণীদের দেহে অবস্থিত আত্মা সর্বদাই অবধ্য। অতএব কোন জীবের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩১ – ৩৮ – কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে যুদ্ধ কর

***শ্লোক ৩১-৩২ — (সঙ্গতি) আরও, এই যে মহৎ শ্রেয়ঃ আপনা হতেই উপস্থিত হওয়ায় তুমি বিকম্পিত হচ্ছ কেন? এটিই বলছেন–**

"আমি স্বজন বধ করে কিভাবে সুখি হব?" অর্জুনের এই যুক্তিও নিরস্ত হলো –

যুদ্ধ না করার ২য় যুক্তি (উপভোগ) খণ্ডন – ক্ষত্রিয়রূপে তোমার স্বধর্ম বিবেচনা করে তোমার জানা উচিত যে, ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করার থেকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকর আর কিছুই নেই। তাই, তোমার দ্বিধাগ্রস্থ হওয়া উচিত নয়। হে পার্থ! স্বর্গদ্বার উন্মোচনকারী এই প্রকার ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ না চাইতেই যে সব ক্ষত্রিয়ের কাছে আসে, তাঁরা সুখী হন।

***শ্লোক ৩৩-৩৬ — (সঙ্গতি) অন্যথা আচরণের দোষ দেখাচ্ছেন –**

এই ধর্মযুদ্ধ না করার পরিণতি – কিন্তু, তুমি যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তা হলে তোমার স্বীয় ধর্ম এবং কীর্তি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পাপ ভোগ করবে। সমস্ত লোক তোমার কীর্তিহীনতার কথা বলবে এবং যে-কোন মর্যাদাবান লোকের পক্ষেই এই অসম্মান মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর মন্দ। সমস্ত মহারথীরা মনে করবেন যে, তুমি ভয় পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছ এবং তুমি যাদের কাছে সম্মানিত ছিলে, তারাই তোমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য জ্ঞান করবে। তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে বহু অকথ্য কথা বলবে। তার চেয়ে অধিকতর দুঃখদায়ক তোমার পক্ষে আর কি হতে পারে?

***শ্লোক ৩৭ — (সঙ্গতি) পূর্বে অর্জুন বলেছিলেন (২/৬ শ্লোকে) "তাদের জয় করা শ্রেয়, না তাদের দ্বারা পরাজিত হওয়া শ্রেয়, তা আমি বুঝতে পারছি না।" এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন –**

যুদ্ধ না করার ৫ম যুক্তি (সিদ্ধান্তহীনতা) খণ্ডন – হে কুন্তীপুত্র! এই যুদ্ধে নিহত হলে তুমি স্বর্গ লাভ করবে, আর জয়ী হলে পৃথিবী ভোগ করবে। অতএব যুদ্ধের জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে উত্থিত হও।

***শ্লোক ৩৮ — (সঙ্গতি) পূর্বে অর্জুন বলেছিলেন (১/৩৬ শ্লোকে) "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্..." ইত্যাদি (এদেরকে বধ করলে মহাপাপ আমাদের আচ্ছন্ন করবে।) এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন –**

যুদ্ধ না করার ৩য় যুক্তি (পাপের ভয়) খণ্ডন – সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ও জয়-পরাজয়কে সমান জ্ঞান করে তুমি যুদ্ধের নিমিত্ত যুদ্ধ কর, তা হলে তোমাকে পাপভাগী হতে হবে না।

শ্লোক ৩৯ - ৫৩ - বুদ্ধিযোগ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে যুদ্ধ কর

***শ্লোক ৩৯ — (সঙ্গতি) উপদিষ্ট জ্ঞানযোগের উপসংহার করে তার সাধনভূত কর্মযোগের প্রস্তাব করছেন –**

ভক্তিযোগ সম্বন্ধিনী বুদ্ধি – হে পার্থ! আমি তোমাকে সাংখ্য-যোগের কথা বললাম। এখন ভক্তিযোগ সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর, যার দ্বারা তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে।

***শ্লোক ৪০ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "ওহে! কখনও কখনও প্রচুর বিঘ্ন থাকলে কৃষিকার্যের ন্যায় কর্মফল নষ্ট হয়, আর মন্ত্রাদির অঙ্গহানি হলেও হবার সম্ভাবনা আছে, অতএব কর্মযোগের দ্বারা কিভাবে কর্মবন্ধন নষ্ট হইবে?" এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন —**

ভক্তিযোগের অব্যর্থতা – ভক্তিযোগের অনুশীলন কখনও ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনও ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।

***শ্লোক ৪১ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "কেন রক্ষা করেন?" এর উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম ও সকাম কর্মের পার্থক্য দেখিয়ে বলছেন —**

ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে পার্থক্য – যারা এই পথ অবলম্বন করেছে তাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ। হে কুরুনন্দন, অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহু শাখাবিশিষ্ট ও বহুমুখী।

***শ্লোক ৪২-৪৪ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "সকাম কর্মীরা কষ্টসাধ্য কাম্য কর্ম পরিত্যাগ করে ঈশ্বরে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কেন করে না?" তার উত্তর শ্রীভগবান বলছেন —**

বেদের পুষ্পিত বাক্য – বিবেকবর্জিত লোকেরাই বেদের পুষ্পিত বাক্যে আসক্ত হয়ে স্বর্গসুখ ভোগ, উচ্চকুলে জন্ম, ক্ষমতা লাভ আদি সকাম কর্মকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ ও ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা বলে যে, তার উর্ধ্বে আর কিছুই নেই। যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেকবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।

***শ্লোক ৪৫ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "যদি স্বর্গাদি লাভ পরমফলই নয়, তবে কেন বেদ তার সাধনরূপ কর্মাদির বিধান করেন?" তার উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন —**

যুদ্ধ না করার ৪র্থ যুক্তি (কুলক্ষয়) খণ্ডন – বেদে প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। হে অর্জুন! তুমি সেই গুণগুলিকে অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও। সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও এবং লাভ-ক্ষতি ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হও।

***শ্লোক ৪৬ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "ওহে! বেদে বর্ণিত নানা ফল ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে ঈশ্বর-আরাধনা-বিষয়ক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিও কুবুদ্ধিই বটে।" এরকম কথা আশঙ্কা করে শ্রীভগবান বলছেন —**

দৃষ্টান্তঃ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয় – ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে সমস্ত প্রয়োজন সাধিত হয়, সেগুলি বৃহৎ জলাশয় থেকে আপনা হতেই সাধিত হয়ে যায়। তেমনই, ভগবানের উপাসনার মাধ্যমে যিনি পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করে সব কিছুর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে বেদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে।

***শ্লোক ৪৭ — (সঙ্গতি) এর প্রেক্ষিতে অর্জুন যদি বলেন,** "তবে, পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনাতেই সকল কর্মফল লাভ হয় — এই অভিসন্ধিতে সকলে প্রবৃত্ত হউক; কর্ম করে কি হবে?" তাই অর্জুনের এই সম্ভাব্য আশংকা নিবারণ করার জন্য **শ্রীভগবান** বলছেন—

জীবের অধিকার (কিসে আছে - কিসে নেই) – স্বধর্ম বিহিত কর্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্মফলে তোমার অধিকার নেই। কখনও নিজেকে কর্মফলের হেতু বলে মনে করো না এবং কখনও স্বধর্ম আচরণ না করার প্রতি আসক্ত হয়ো না।

***শ্লোক ৪৮ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "তবে কি করতে হবে?" তার উত্তর শ্রীভগবান বলছেন —**

যোগের সংজ্ঞা – হে অর্জুন! ফলভোগের কামনা পরিত্যাগ করে ভক্তিযোগস্থ হয়ে স্বধর্ম-বিহিত কর্ম আচরণ কর। কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সম্বন্ধে যে সমবুদ্ধি, তাকেই যোগ বলা হয়।

***শ্লোক ৪৯ — (সঙ্গতি) কাম্যকর্ম অতি নিকৃষ্টতার কথা বলছেন –**

কৃপণের সংজ্ঞা – হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ দ্বারা ভক্তির অনুশীলন করে সকাম কর্ম থেকে দূরে থাক এবং সেই চেতনায় অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের শরণাগত হও। যারা তাদের কর্মের ফল ভোগ করতে চায়, তারা কৃপণ।

***শ্লোক ৫০ — (সঙ্গতি) কিন্তু বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তি শ্রেষ্ট –**

পাপ-পুণ্য থেকে মুক্তির উপায় – যিনি ভগদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তিনি এই জীবনেই পাপ ও পুণ্য উভয় থেকেই মুক্ত হন। অতএব, তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর। সেটিই হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ কর্মকৌশল।

***শ্লোক ৫১ — (সঙ্গতি) কর্মসকলের মোক্ষসাধনত্ব কি প্রকার হয়? –**

মোক্ষ লাভের উপায় – মনীষিগণ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে কর্মজাত ফল ত্যাগ করে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এভাবে তাঁরা সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার অতীত অবস্থা লাভ করেন।

***শ্লোক ৫২-৫৩ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "কবে আমি সেই পদ লাভ করব?" এই অপেক্ষায় দুটি শ্লোকে বলছেন —**

নিষ্কাম কর্ম অভ্যাসের ফল – এভাবে পরমেশ্বর ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করতে করতে যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গভীর অরণ্যকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করবে, তখন তুমি যা কিছু শুনেছ এবং যা কিছু শ্রবণীয়, সেই সবের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হতে পারবে। তোমার বুদ্ধি যখন বেদের বিচিত্র ভাষার দ্বারা আর বিচলিত হবে না এবং আত্ম-উপলব্ধির সমাধিতে স্থির হবে, তখন তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করে ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত হবে।

শ্লোক ৫৪ - ৭২ - স্থিতপ্রজ্ঞ বা সমাধি স্তরে অধিষ্টিত হয়ে যুদ্ধ কর

***শ্লোক ৫৪ — (সঙ্গতি) পূর্বশ্লোকে কথিত আত্মতত্ত্বজ্ঞের লক্ষণ জানতে ইচ্ছা করে অর্জুনের জিজ্ঞাসা –**

স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে ৪টি প্রশ্ন – অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন- হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচলা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের লক্ষণ কি? তিনি কিভাবে কথা বলেন, কিভাবে অবস্থান করেন এবং কিভাবেই বা তিনি বিচরণ করেন?

***শ্লোক ৫৫-৫৬ — (সঙ্গতি) এস্থলে যাহা সাধকদের জ্ঞানের সাধন, তা-ই সিদ্ধব্যক্তির স্বাভাবিক লক্ষণ, এই হেতু সিদ্ধব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করতে করতে অন্তরঙ্গ সাধন সমূহ এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত বলছেন –**

স্থিতপ্রজ্ঞের সংজ্ঞা – পরমেশ্বর ভগবান বললেন- হে পার্থ! জীব যখন মানসিক জল্পনা-কল্পনা থেকে উদ্ভুত সমস্ত মনোগত কাম পরিত্যাগ করে এবং তার মন যখন এভাবে পবিত্র হয়ে আত্মাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে, তখনই তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। ত্রিতাপ দুঃখ উপস্থিত হলেও যাঁর মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখ উপস্থিত হলেও যাঁর স্পৃহা হয় না এবং যিনি রাগ, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত, তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ।

***শ্লোক ৫৭ — (সঙ্গতি) অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, "স্থিতপ্রজ্ঞ কি বলেন?" এর উত্তরে বলছেন —**

জড় জগতে যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তি রহিত, যিনি প্রিয় বস্তু লাভে আনন্দিত হন না এবং অপ্রিয় বিষয় উপস্থিত হলে দ্বেষ করেন না, তিনি পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

***শ্লোক ৫৮ — (সঙ্গতি) অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, "কিমাসীত – কিভাবে অবস্থান করেন?" এর উত্তরে বলছেন —**

দৃষ্টান্ত ~ স্থিতপ্রজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় – কূর্ম যেমন তার অঙ্গসমূহ তার কঠিন বহিরাবরণের মধ্যে সঙ্কুচিত করে, তেমনই যে ব্যক্তি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন, তাঁর চেতনা চিন্ময় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।

***শ্লোক ৫৯ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "ওহে! ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে অপ্রবৃত্তিই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ হতে পারে না; কেননা জড়, আতুর, উপবাস পরায়ণ ব্যক্তিগণেরও বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তি থাকে না।" এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন —**

ভক্তি প্রবৃত্তি ~ বিষয় নিবৃত্তি – দেহবিশিষ্ট জীব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফলে তিনি সেই বিষয়তৃষ্ণা থেকে চিরতরে নিবৃত্ত হন।

***শ্লোক ৬০-৬১ — (সঙ্গতি) ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত স্থিতপ্রজ্ঞতা সম্ভব হয় না, অতএব সাধনাবস্থাতে সংযম-বিষয়ে মহাযত্ন করা কর্তব্য, এ কথাই দুটি শ্লোকে বলছেন —**

বাহ্য ইন্দ্রিয় সংযমের অভাবে সৃষ্ট দোষ – হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়সমূহ এতই বলবান এবং ক্ষোভকারী যে, তারা অতি যত্নশীল বিবেকসম্পন্ন পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে। যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করে আমার প্রতি উত্তমা ভক্তিপরায়ণ হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

***শ্লোক ৬২-৬৩ — (সঙ্গতি) পূর্বশ্লোকে বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযমের অভাবে যে দোষ ঘটে তা বলে এখন দুইটি শ্লোকদ্বারা মনঃসংযমের অভাবজনিত দোষ বলছেন —**

মনঃসংযমের অভাবে সৃষ্ট দোষ – ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কাম উৎপন্ন হয় এবং কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে সর্বনাশ হয়। অর্থাৎ মানুষ পুনরায় জড় জগতের অন্ধকূপে অধঃপতিত হয়।

***শ্লোক ৬৪-৬৫ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, "ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতই বিষয়ের অভিমুখী, তাদেরকে নিরোধ করতে পারা যায় না বলে উক্ত দোষ পরিহার করা দুষ্কর, অতএব স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভাবে হওয়া যায়?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করে শ্রীভগবান তার উত্তর দুটি শ্লোকদ্বারা বলছেন —**

স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভাবে হওয়া যায় ~ রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ – সংযতচিত্ত মানুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি এবং অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁর বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে ভগবানের কৃপা লাভ করেন। চিন্ময় চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তখন আর জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থাকে না, এভাবে প্রসন্নতা লাভ করার ফলে বুদ্ধি শীঘ্রই স্থির হয়।

***শ্লোক ৬৬ — ইন্দ্রিয়নিগ্রহ স্থিতপ্রজ্ঞতার সাধন; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না হলে স্থিতপ্রজ্ঞতা হয় না, এটি ব্যতিরেকভাবে[5] প্রতিপন্ন করছেন —**

পরমার্থ চিন্তাশূন্য ব্যক্তির পরিণতি – যে ব্যক্তি [কৃষ্ণভাবনায়] যুক্ত নয়, তার চিত্ত সংযত নয় এবং তার পারমার্থিক বুদ্ধি থাকতে পারে না। আর পরমার্থ চিন্তাশূন্য ব্যক্তির শান্তি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। এই রকম শান্তিহীন ব্যক্তির প্রকৃত সুখ কোথায়?

***শ্লোক ৬৭ — অর্জুন যদি বলেন, "অযুক্ত ব্যক্তির শুদ্ধবুদ্ধি জন্মাতে পারে না কেন?" তার উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন —**

দৃষ্টান্ত ~ অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় – প্রতিকূল বায়ু নৌকাকে যেমন অস্থির করে, তেমনই সদা বিচরণকারী যে কোন একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণেও মন অসংযত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকে হরণ করতে পারে।

***শ্লোক ৬৮ — ইন্দ্রিয়সংযম যে স্থিতপ্রজ্ঞতার সাধন ও লক্ষণ, এটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এখন তার উপসংহার করছেন –**

সুতরাং, হে মহাবাহো! যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হয়েছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

***শ্লোক ৬৯ — অর্জুন যদি বলেন, "নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় দর্শনাদি-ব্যাপারশূন্য সম্যক্ নিগৃহীত ইন্দ্রিয় এমন কাউকে দেখছি না, অতএব এরূপ লক্ষণ অসম্ভব।" একথা আশঙ্কা করে শ্রীভগবান বলছেন —**

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সাথে সাধরন জীবের পার্থক্য – সমস্ত জীবের পক্ষে যা রাত্রিস্বরূপ, স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরিত থেকে আত্ম-বুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। আর যখন সমস্ত জীবেরা জেগে থাকে, তখন তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট তা রাত্রিস্বরূপ।

***শ্লোক ৭০-৭১ — অর্জুন যদি আবার বলেন, "বিষয় সমূহে দৃষ্টি থাকে না বলে কি করে সেই যোগী ব্যক্তি বিষয়সমূহ ভোগ করতে পারেন?" তার উত্তরে বলছেন —**

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত শান্তি লাভ করেন – বিষয়কামী ব্যক্তি কখনও শান্তি লাভ করে না। জলরাশি যেমন সদা পরিপূর্ণ এবং স্থির সমুদ্রে প্রবেশ করেও তাকে ক্ষোভিত করতে পারে না, কামসমূহও তেমন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হয়েও

5 ব্যতিরেকভাবে - পরোক্ষভাবে (অন্বয়াৎ – প্রত্যক্ষভাবে)

তাঁকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না, অতএব তিনিই শান্তি লাভ করেন। যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে জড় বিষয়ের প্রতি নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমত্ববোধ রহিত হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করেন।

***শ্লোক ৭২ — পূর্বোক্ত জ্ঞাননিষ্ঠাকে প্রশংসা করতে করতে উপসংহার করছেন —**

ব্রাহ্মীস্থিতির সংজ্ঞা ও ফল – তার এই প্রকার স্থিতিকেই ব্রাহ্মীস্থিতি বলে। হে পার্থ! যিনি এই স্থিতি লাভ করেন, তিনি মোহপ্রাপ্ত হন না। জীবনের অন্তিম সময়ে এই স্থিতি লাভ করে, তিনি এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করেন।

অধ্যায় উপসংহার

*** শ্রীল শ্রীধর স্বামী →

শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম॥
যিনি শোকরূপ পঙ্কে নিমগ্ন ভক্ত অর্জুনকে সাংখ্যযোগ উপদেশ দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার আশ্রয়।

*** শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর →

জ্ঞানং কর্ম চ বিস্পষ্টং অস্পষ্টং ভক্তিমুক্তবান্।
অতএবায়মধ্যায়ঃ শ্রীগীতাসূত্রমুচ্যতে॥
এই অধ্যায়কে গীতাসূত্র বলা যায়, যেহেতু ইহাতে বিশিষ্টরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান এবং অস্পষ্টরূপে ভক্তি উক্ত হয়েছে।

*** শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ →

নিষ্কামকর্মভির্জ্ঞানী হরিমেব স্মরণ ভবেৎ।
অন্যথা বিঘ্ন এবেতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়নির্ণয়ঃ॥
নিষ্কাম-কর্মসমূহের দ্বারা হরিকেই স্মরণ করতে করতে জ্ঞানী হবে। অন্যথা বিঘ্ন হবেই, এটি দ্বিতীয় অধ্যায়ে নির্ণীত হয়েছে।

*** শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর →

এই অধ্যায়কে 'গীতাসূত্র' বলা যায়; যেহেতু এখানে বিস্পষ্টরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান এবং অস্পষ্টরূপে তৎ-উদ্দিষ্ট ভক্তি উক্ত হয়েছে। ১০ম শ্লোক পর্যন্ত প্রশ্নকর্তার স্বভাবপরিচয়, ১১ শ্লোক হতে ৩০ শ্লোক পর্যন্ত আত্ম-অনাত্ম বিবেক, ৩১ শ্লোক হতে ৩৮ শ্লোক পর্যন্ত স্বধর্মরূপ কর্মের অন্তর্গত পাপ-পুণ্য-বিচার এবং ৩৯ শ্লোক হতে অধ্যায় সমাপ্তি-পর্যন্ত পূর্বোক্ত জ্ঞান ও কর্মের সংযোজকরূপ আত্ম-যাথাত্ম্যসাধক নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এবং সেই যোগস্থিত পুরুষের (জীবের) জীবন ও আচার প্রদর্শিত হয়েছে।

*** শ্রীল প্রভুপাদ →

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়কে সমগ্র ভগবদ্গীতার সারাংশ বলে বর্ণনা করেছেন। ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু হচ্ছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে এবং সমগ্র গীতার সারমর্ম-স্বরূপ ভক্তিযোগের আভাস দেওয়া হয়েছে।